সকল পাঠক, পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই শুভ শারদীয়ার (২০২১) প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ত্রৈমাসিক

আনন্দ অঙ্গন

বর্ষ-৮, সংখ্যা: ৪, অক্টোবর, ২০২১ AANANDA AANGAN আশ্বিন ১৪২৮

আজও দেবী পক্ষের সূচনা হয় বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের উদাত্ত কণ্ঠস্বরে

কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার

যত দূর স্মৃতি যায়, মহালয়ার ঠিক আগে বাড়িতে রেডিও নিয়ে বড়রা খুব বাতিব্যস্ত হয়ে উঠতো। তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং ব্যাটারি পরিবর্তন অবশ্যই করা হতো। ধীরে ধীরে রেডিওর জনপ্রিয়তা অনেকটাই দখল করে নিয়েছিল দূরদর্শন। তখন এই বিষয়টা আরো বেশি করে চোখে পড়তো। হ্যাঁ বাঙালির ওই একদিন আর কিচ্ছু চাই না, শুধু শেষ রাতে অন্ধকার থাকতে ঘরে যেন বেজে ওঠে সেই প্রবাদপুরুষ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে 'আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জীর/ ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা/ প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা।' ফলত, জ্ঞান অবধি মহালয়া বলতে বুঝি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চন্ডীপাঠ, এই না হলে তেমন করে যেন হৃদয়ে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব-এর অনুভূতি জাগ্রত হয় না।

১৯০৫ সালের ৪ আগস্ট উত্তর কলকাতায় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের জন্ম হয়। তাঁর বাবা কালীকৃষ্ণ ভদ্র ছিলেন বহু ভাষাবিদ। তিনি ১৪টি ভাষা জানতেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর যথেষ্ট অবদান আছে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মায়ের নাম সরলাবালা দেবী। উত্তর কলকাতায় রামধন মিত্র স্ট্রিটের তাঁর বিশাল হলুদ রংয়ের বাড়ির সামনে সাদা পাথরের ফলকে এখনো খোদাই করে লেখা, 'স্বর্গীয় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র'। সঙ্গে জন্ম-মৃত্যুর তারিখ। তার নীচে তিনটে লাইন, 'এই বাড়িতেই আমৃত্যু বাস করেছেন বেতারে মহিষাসুরমর্দিনীর সর্বকালজয়ী অন্যতম রূপকার এই সুসন্তান।'

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ১৯২৬ সালে ইন্টারমিডিয়েট ও ১৯২৮ সালে কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে স্নাতক হন। ১৯৩০-এর দশক থেকে সুদীর্ঘকাল অল ইন্ডিয়া রেডিওর বেতার সম্প্রচারকের কাজ করেছেন।

চিত্রশিল্পী : প্রদীপ চৌধুরী

প্রায় একই সঙ্গে তিনি একাধিক নাটক রচনা ও প্রযোজনাও করেছেন। কিন্তু বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র বললেই মানুষের মনে প্রথম জাগ্রত হয় 'মহিষাসুরমর্দিনী' স্তোত্র পাঠ -

'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নম নমঃ।'

জানা যায় এই অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারিত হত প্রথমদিকে। অনুষ্ঠানটিকে উন্নততর করে তোলার জন্য নিয়মিত রিহার্সেল হত। সৃষ্টি করা হতো পুরোপুরি পুজোর পরিবেশ এবং আবহ। আকাশবাণী সাজানো হতো ফুল দিয়ে। ধূপ ধুনো সবকিছু মিলেয়ে এক দৈবিক পরিবেশ। রাত দুটোর সময় আকাশবাণীর গাড়ি পৌঁছতো তাঁর বাড়িতে। গঙ্গা স্নান করে শ্বেত বস্ত্রে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র আসতেন চণ্ডী পাঠ শুরু করতে। বাকিরাও আসতেন পুজোর বেশ পরিধান করে। সৃষ্টি হত সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক পরিবেশ। তিনি নির্দেশ দিতেন একটু ধ্যান করে শুরু করার জন্য। সেই আবহও কল্পনা করলে মন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

১৯৩১ সালে প্রথম 'মহিষাসুরমর্দিনী' সম্প্রচারিত হয়। বাঙালি হৃদয়ে এই অনুষ্ঠান এমন জায়গা করে নেয়, যে পরবর্তী প্রায় প্রতিটি মহালয়াতে তা সম্প্রচারিত হয়ে

এরপর ৩ পাতায়

শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগর

তুলসী সরকার

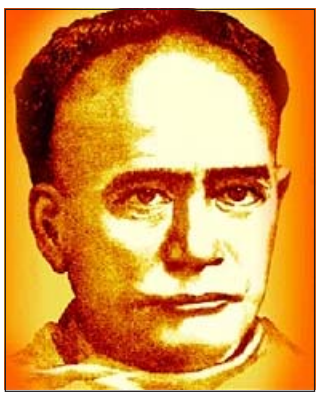

বাংলা ও বাঙালির নবজাগরণে যে কতিপয় মানুষ আত্মনিয়োগ করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁদের মধ্যে অগ্রণী। বাংলা গদ্যের জনক না হলেও বাংলাভাষাকে দাঁড়ি-কমা চিহ্ন দ্বারা সুষমামণ্ডিত সুখপাঠ্য করে তোলার প্রথম প্রয়াস তাঁরই। তিনিই প্রথম বাংলা লিপি সংস্কার করে সহজবোধ্য করে তুলতে চেয়েছিলেন। প্রথম সার্থক গদ্যকার তো তিনিই। ১৮৫৫ সালে বাংলা নববর্ষের দিনে প্রথম বর্ণপরিচয় প্রকাশ করে তিনি বাঙালির হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তার দু-বছর আগে নিজগ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয় গড়ে সবার নজর কেড়ে নিয়েছিলেন। আজ থেকে দুশো বছর আগে মেদিনীপুরের এক অখ্যাত গ্রাম থেকে কলকাতা শহরে এসে শুধু নিজে শিক্ষিত হননি, গোটা সমাজে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে দিতে চেষ্টার অন্ত ছিল না তাঁর। তাঁর হাত ধরেই নারী শিক্ষার এক প্রবল ঝড় বয়ে গেছিল তাঁর সময়ে। তাঁর উদ্যোগেই ১৮৫৭-৫৮ সালে এক বছরে সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে প্রায় ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। আজকের বেথুন কলেজিয়েট স্কুল থেকে বিদ্যাসাগর কলেজের গোড়াপত্তন তো তাঁরই অক্লান্ত প্রয়াসে। পাশে পেয়েছিলেন সে সময়ের আরও বহু শিক্ষানুরাগী মানুষকেও। তাঁরাও কম স্মরণীয় নন। এককথায়, সমাজ সংস্কারক, বিধবা বিবাহ ও স্ত্রী শিক্ষার প্রচলনে বিদ্যাসাগর ছিলেন অগ্রণীর ভূমিকায়। সামগ্রিকভাবে বাংলার নবজাগরণের পুরোধা পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর মেধা, পাণ্ডিত্য এবং দরিদ্র-আর্ত মানুষের প্রতি সহানুভূতিই তাঁকে একদিকে বিদ্যাসাগর অন্যদিকে দয়ার সাগর উপাধিতে ভূষিত করেছে। ১৮৩৯ সালে হিন্দু ল-কমিটির যে পরীক্ষা হয়েছিল তাতে তাঁর পারদর্শিতা দেখে কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিদ্যাসাগর উপাধি প্রথম দিয়েছিলেন। তার আগে সে সময়ের অলংঙ্কার পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন তিনি। সেই পরীক্ষায় প্রথম হবার সুবাদে পুরস্কার স্বরূপ পেয়েছিলেন 'রঘুবংশম', 'উত্তর রামচরিত', 'মালতীমাধব' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত বই। যে বইগুলি তিনি সহজপাঠ্য অনুবাদ করে বাঙালির হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তারই ফলস্বরূপ একে-একে আমরা পেয়েছিলাম আখ্যানমঞ্জরী, কথামালা, সীতার বনবাস, কাদম্বরী, মেঘদূতম, হর্ষচরিত, কিরাতার্জ্জুনীয়, বাল্মিকী রামায়ণ প্রভৃতি অনুদিত সাহিত্যসম্ভার, পেয়েছি শেক্সপিয়রের কমেডি অব এররস-এর রূপান্তরে ভ্রান্তিবিলাস। পেয়েছি অসংখ্য উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তকও,

এরপর ৪ পাতায়

সাহিত্য আকাদেমির 'ফেলো' শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য আকাদেমির 'ফেলো' নির্বাচিত হলেন সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। এই সন্মান আকাদেমি সেই সাহিত্যিকদেরই জানায়, যাঁরা সংস্থার মতে 'অমর সাহিত্যের স্রষ্টা'। সেই হিসেবে দেখলে, এটি আকাদেমির সর্বোচ্চ সন্মান।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আরও সাতজন ভারতীয় লেখককে এই সন্মান জানাল সাহিত্য আকাদেমি। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার সাহিত্যিক রয়েছেন সেই তালিকায়। রয়েছেন ইংরেজি ভাষার সাহিত্যিক রাসকিন বন্ড, মারাঠি কবি-প্রাবন্ধিক বালচন্দ্র নেমাডেও।

শীর্ষেন্দু বাবু তাঁর সৃষ্টির জন্য একাধিক পুরস্কারে সন্মানিত হয়েছেন। যার মধ্যে রয়েছে বিদ্যাসাগর পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার, সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারও।

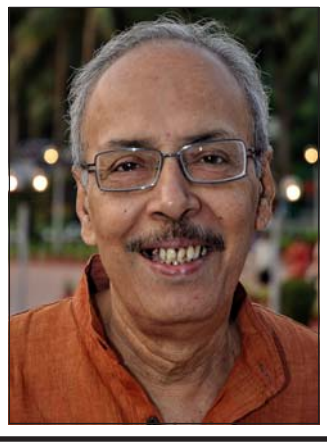

১৯৬৭ সালে প্রথম উপন্যাস 'ঘুণপোকা'-তেই পাঠকের নজর কেড়েছিলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। তারপর একে একে প্রকাশিত হয় 'কাগজের বউ', 'যাও পাখি', 'মানবজমিন', 'দূরবীন'-এর মতো সাড়া জাগানো উপন্যাস। বাংলা ছোটগল্পের আঙিনাতেও সফল অভিযান আজও অব্যাহত রয়েছে ৮৫ বছর বয়সি এই কথাকারের। পাশাপাশি 'গোঁসাইবাগানের ভূত', 'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি', বা 'পাতালঘর'-এর মতো চমকপ্রদ কিশোর-কাহিনীতেও তাঁর কলম সমান দক্ষ। বাংলা সাহিত্যে জাদু বাস্তবতার এক অন্য নিদর্শন তিনি রেখেছেন এবং রেখে চলেছেন।

এর আগে সাহিত্য আকাদেমির ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষের মত ব্যক্তিত্ব।

চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির

আনন্দ-অঙ্গন

সম্পাদকীয়

শারদ অর্ঘ্য

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ

শারদোৎসব বাঙালির মহা উৎসব। সমস্ত বাঙালির দুঃখযন্ত্রণা ভুলে এতে মেতে ওঠে। দিন বদলায়, বছর বদলায়, উৎসব উদযাপনের নতুন রীতি আসে, তবুও শারদোৎসব তার মহিমায় অমলিন থাকে। এর ঐতিহ্য আজও অনন্য।

প্রকৃত অর্থে শারদোৎসব হল আপামর বাঙালির মিলনোৎসব। এই উৎসব মানুষকে বিভেদ ভুলিয়ে দেয়। ধনী দরিদ্র সকলেই এতে গা ভাসায়। আত্মীয়তা ও আন্তরিকতার মোড়কে এটি এমন এক উৎসব, রাতে গড়ে ওঠে নতুন সম্পর্ক। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই উদ্যমে, উচ্ছ্বাসে আনন্দে মেতে ওঠে।

উৎসবের আঙিনায়, আলোকের ঝর্ণাধারায় কাশফুলের শুভ্রতায় মুছে যাক সব গ্লানি ও মলিনতা। পরিশেষে সবাইকে জানাই শুভ শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মানবধর্ম

স্বপন গায়েন

মানুষের চিন্তার আদর্শ সত্য, কৃতি বা কর্মের আদর্শ শিব আর অনুভূতির আদর্শ সুন্দর। লক্ষণীয় এই যে মানুষের জীবনের এই তিনটি আদর্শ নিয়ে তিনটি আদর্শ বিজ্ঞান (Normative Science) গড়ে উঠেছে। যে আদর্শ বিজ্ঞান সত্য নিয়ে আলোচনা করে তার নাম ন্যায়শাস্ত্র। যে আদর্শ বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় শিব, তার নাম নীতিশাস্ত্র বা নীতিবিজ্ঞান। আর যে আদর্শ বিজ্ঞান সুন্দরকে নিয়ে আলোচনা করে তার নাম কান্তি বিদ্যা বা রসশাস্ত্র। আমরা এখন মানব জীবনের আদর্শ নিয়ে আলোচনা করব।

এখানেও প্রশ্ন জাগতে পারে যে, সত্য-শিব-সুন্দরের সৃষ্টির কারণ কী, বা এই ধারণা মানুষের মনে কীভাবে উৎপন্ন হল? সত্য-শিব-সুন্দরের ধারণা তো আর জলের স্রোতে ভেসে চলে আসে না এবং এই সমস্ত সৃষ্টির জন্য তোমার বা আমার সাহায্যের অপেক্ষায় সৃষ্টি কর্তা অপেক্ষমান তাহাও নয়। তাহলে আমাদের সব কিছুতেই সৃষ্টি কর্তা নিশ্চয় একজন আছে। আর এই সৃষ্টি কর্তা কোন সাধারণ মানুষ হতে পারে না। আর তাই যদি না হয়, তাহলে অন্যকোন শক্তির উপর নির্ভরশীল হতে হয়। সেই শক্তি বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হতে পারে। আমরা বলব, সেই শক্তি ঈশ্বর, ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন শক্তি বা ব্যক্তি নন। উপনিষদে বলা হয়েছে - সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, তিনিই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। আর তিনিই বা কেন মানব জন্ম সৃষ্টি করলেন। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, সেই হেতু তিনি আমাদের সবার প্রতি সমান আচরণ করবেন. কিন্তু আমরা বাস্তবে বা আমাদের সমাজে আপাতত দৃষ্টিতে আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে, আমাদের প্রত্যেক মানুষের মানবিকতাকে মূল্য দেওয়া হয় না। মানুষের মধ্যে বিভিন্ন বিভেদ একে অপর থেকে আলাদা করে রাখা হয়। মানুষের কাছ থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়।

ধর্মের বৈষম্য, বর্ণবৈষম্য, সামাজিক বৈষম্য, মানুষে মানুষে প্রভেদ মানুষের মানবিকতা, মানুষের মনুষ্যত্বকে মূল্য দেয় না। মানুষ মানুষকে ঘৃণা করে, এমনকি মানুষের কর্মের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। নিম্নবর্ণের মানুষ বেদ পাঠ করতে পারবে না। এই বর্তমান শিক্ষিত সমাজের মানুষও ছুঁৎ মার্গের বা অস্পৃশ্য জাতিকে স্পর্শ করলে, একই জায়গায় বসে খাবার খেলে দোষ হয়। এই বিষটি মানুষর মনে বা ধারণায় শিকড় গেড়ে বসে আছে। আমাদের মনের পর্দার আড়ালে এমন একটা ধারণা তৈরি করেছে যে, আমি খৃষ্টান, আমি জৈন, আমি বৌদ্ধ, আমি মুসলমান, আমি ব্রাহ্মণ, আমি বৈষ্ণব, আমি শাক্ত ইত্যাদি। কিন্তু মানুষ নিজেকে যে ধর্মাবলম্বী বলে জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিশ্চিন্ত আছে সে হয়ত সত্য তা নয়। *নাম গ্রহণেই এমন একটা আড়াল তৈরি করে দেয় যাতে নিজের ভিতরকার ধর্মটা তার নিজের চোখেও পড়ে না। কোন্ ধর্মটি তার?*

আমাদের একটাই পরিচয় যে, আমরা সবাই মানুষ। আমাদের ধর্ম মানবতা। তাই চন্ডীদাস গেয়েছিলেন --- 'শুনহ মানুষ ভাই সবার ঔপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে, ধর্ম এক বিশ্বজনীন ব্যাপার। ধর্মকে তাই কোন সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখতে তাঁর মন সায় দেয়নি। রবীন্দ্রনাথ ধর্মকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় বলে মনে করেননি। তিনি বলেন, 'আমার ধর্ম আমার জীবনেরই মূল্যে।' ধর্ম যে কতকগুলো আচরণ বিধি নয়, ধর্ম যে নিছক ঈশ্বর ভক্তিময় --- এবিষয়ে তিনি দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। কতগুলো নিয়মনিষ্ঠা কর্ম সম্পাদনই ধর্মের শেষ কথা নয়। তাছাড়া, ধর্ম কোন নিষ্প্রাণ শুষ্ক বিষয় নয়। রবীন্দ্রনাথের ধর্মের কেন্দ্রীয় চরিত্র তাই ঈশ্বর না হয়ে মানুষ হয়েছে। তিনি তাই তাঁর ধর্মকে 'মানব ধর্ম' বলে অভিহিত করেছেন। কাজেই আমরা সবাই একটাই পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকি আমরা 'মানুষ'। আর 'মানবধর্ম' আমাদের ধর্ম। আর মানব প্রেমই শ্রেষ্ঠ প্রেম, এই প্রেমের জন্যই স্বর্গ পৃথিবী হতে চায়, দেবতারা মানুষ হতে চান।

এরপর ৩ পাতায়

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ

শিল্পকলার ইতিহাস

ইতিহাস বলতে নান্দনিক বা ভাব-বিনিময়ের উদ্দেশ্যে মানুষের দ্বারা নির্মিত সেই সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুর ইতিহাসকে বোঝায় যেগুলির মারফত বিভিন্ন ধারণা, আবেগ বা সাধারণভাবে কোনো দৃষ্টিভঙ্গী দর্শকসমক্ষে উপস্থাপিত হয়েছে। বিভিন্ন যুগে দৃশ্য কলার বিভিন্ন রকম শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে, যেমন - আধুনিক ললিত কলা ও ফলিত কলার বিভাজন অথবা মানব মননের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে কলাবিদ্যাকে তুলে ধরে প্রদত্ত বিভিন্ন সংজ্ঞা। বিংশ শতাব্দীতে কলার প্রধান শাখা হিসেবে নয়টি বিদ্যাকে চিহ্নিত করা হয়, যথা স্থাপত্য, নৃত্য, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, কাব্য (সাধারণভাবে সাহিত্যের অংশ হিসেবে চিহ্নিত, যার মধ্যে নাটক ও অন্যান্য বিবরণীও পড়ে), চলচ্চিত্র, ফটোগ্রাফি এবং গ্রাফিক আর্ট। ফ্যাশন ও গ্যাস্ট্রোনমি প্রভৃতি পুরোনো বিদ্যার সাথে ভাব প্রকাশের নতুন অনেক মাধ্যমকেও বর্তমানে শিল্পের মর্যাদা দেওয়া হয়, যথা ভিডিও, ডিজিটাল শিল্পকলার ইতিহাস হল বিভিন্ন বিজ্ঞান ও শিল্পের একটি বহুশাস্ত্রীয় শাখা। এর উদ্দেশ্য হল সময়ের নিরিখে শিল্পের নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন, বিভিন্ন সংস্কৃতির শ্রেণীকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে যুগ বিভাগ।

শিল্পের ইতিহাসের ধারাবাহিক চর্চা পাশ্চাত্যে প্রথম শুরু হয় রেনসাঁস-এর সময়ে এবং তখন এই সদ্যোজাত শাস্ত্রটির উপজীব্য বিষয় ছিল কেবল পাশ্চাত্য শিল্প। সময়ের সাথে সাথে বিশ্বের বিভিন্ন সভ্যতার শিল্পকলার যথাযথ বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে, আর প্রতিটি সভ্যতার শিল্পকে শুধুমাত্র পাশ্চাত্য মাপকাঠিতে বিচার না করে তাদের স্ব-মূল্যায়নের স্বীকৃতিও দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে শিল্পকলার বিশ্বব্যাপী চর্চা, প্রসার ও সংরক্ষণ সম্ভব হয়েছে। বিংশ শতাব্দী জুড়ে ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিল্প জাদুঘর, শিল্প প্রদর্শনশালা প্রভৃতি নির্মিত হয়েছে। এই সমস্ত স্থানে বিভিন্ন প্রকার শিল্পকীর্তির বিশ্লেষণ ও নথিবদ্ধকরণের পাশাপাশি জনসাধারণের উপভোগের স্বার্থে শিল্প প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়। গণমাধ্যমের উদ্ভব ও অগ্রগতি শিল্পকলার চর্চা ও বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রভূত সহায়তা করছে। হুইটনি দ্বিবার্ষিক, সাও পাওলোর দ্বিবার্ষিক, ভেনিসের দ্বিবার্ষিক এবং কাসেলে অনুষ্ঠিত ডকুমেন্ট প্রভৃতির মাধ্যমে শিল্পের নিত্য নতুন ভঙ্গী ও ঐতিহ্যের বিকাশ সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রচলনের মাধ্যমে শিল্পকলায় উৎসাহ প্রদান শুরু হয়েছে। ইউনেস্কোর মত সংস্থাও বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের তালিকা প্রস্তুতির মাধ্যমে পৃথিবীর প্রধান প্রধান সৌধ ও স্মারক প্রভৃতির সংরক্ষণে এগিয়ে এসেছে।

যশ বিদ্ধস্ত 'সোনাগা-৬' গ্রামের অসহায় মানুষের পাশে আমরা

পামেলা দত্ত বসু

আজ থেকে বছর ছয়/সাত আগে সন্তোষপুরের গোপাল কর্মকার মেমোরিয়াল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কর্ণধার শ্রদ্ধেয় শ্রী অমল কুমার কর্মকার মহাশয় একদিন হঠাৎ এলেন আমাদের বিদ্যালয়ে এবং নিজেই পরিচয় করলেন আমাদের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাথে। এরপর উনি আমাদের বিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে আসেন এবং আমাদের গরীব ছাত্রছাত্রীদের নানাভাবে সাহায্য করেন। ওনার মুখ থেকেই গল্প শুনতাম কিভাবে উনি গরীব মানুষের কাছে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেন এবং গরীব মানুষের চিকিৎসার জন্য মেডিকেল ক্যাম্প করেন নানা জায়গায়।

ওনার কথা শুনতে শুনতে আমারও খুব ইচ্ছে হত ওনার ওই বিশাল কর্মকাণ্ড নিজের চোখে দেখার। এই বছর ইয়াসের পরে দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোসাবা থানার অন্তর্গত সোনাগা গ্রামে ত্রাণ সামগ্রী বণ্টনের কাজ দেখার সুযোগ পেলাম।

৩ জুলাই শনিবার ভোর ৬ টায় সন্তোষপুর জোড়া ব্রিজ থেকে গাড়ি ছাড়ল। অমলবাবুর সাথে রইলাম বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, সুস্মিতা চ্যাটার্জী, হাসান পারভেজ, বিবেক দত্ত, সুনীল মন্ডল, আনন্দ হালদার এবং আমি নিজে। সাথে ছিল মশারী, শাড়ি, জামাকাপড়, ত্রিপল, স্যানিটাইজার এবং ছোটদের জন্য বিস্কুট, লজেন্স ইত্যাদি ত্রাণ সামগ্রী।

বেলা ৯.৩০ মিনিটে গদখালি থেকে ভাড়া করা লঞ্চ-এ উঠলাম সমস্ত ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে। একটি লঞ্চে আমরা গুটি কয়েক মানুষ চা, জলখাবার খেতে খেতে আর প্রাকৃতিক

দৃশ্য দেখতে দেখতে সোনাগা দ্বীপটিতে পৌঁছালাম বেলা ১১ টাতে। পাড়ে নেমে দেখি ঐ গ্রামের অল্প কয়েকজন গ্রামবাসী দাঁড়িয়ে আছেন নদীর পাড়ে। প্রথমে একটু হতাশ হয়েছিলাম এত অল্প কয়েকজন দেখে। বাকীদের এসে পৌঁছানোর সময়টুকুর মধ্যে আমরা খুব তাড়াতাড়ি সবাই মিলে ভেঙে যাওয়া বাঁধ দেখতে গেলাম। কী করুণ অবস্থা গ্রামবাসীদের, দেখলাম কীভাবে বাঁধ ভেঙে জল ঢুকে সমস্ত গ্রামকে ভাসিয়েছে। পথ চলতে গ্রামের কিছু পুরুষ ও মহিলাদের সাথে কথা হল, শুনলাম কত কষ্টে তারা দিন কাটাচ্ছে। একটি বাড়িতে বনদেবীর মন্দিরে পূজা করছিলেন যে ভদ্রলোক, উনি, ওনার বাড়ি থেকে আমরা চলে আসার সময় আমাকে ডেকে বললেন, 'দিদি, কলকাতাতে গিয়ে দেখবেন আমাদের যেন পাকা বাঁধ হয়।' সত্যি আমি খুবই লজ্জা পেয়েছি ওনার অনুরোধ শুনে। 'দাদা, আমাদের অত ক্ষমতা নেই।'

নদীর পাড়ে এসে দেখি আবাল বৃদ্ধ বণিতা প্রচুর গ্রামবাসী উপস্থিত হয়েছেন সেখানে। এবারে আমাদের মনটা ভরে গেল। ছোট বাচ্চাদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে তাদের দেওয়া হল বিস্কুটের প্যাকেট আর চকলেট। অবাক হলাম ওই বাচ্চাদের শৃঙ্খলাবোধ দেখে।

গ্রামের মহিলাদের অত কষ্টে থাকা সত্ত্বেও সদা হাস্যমুখ, বাড়ির কর্তারা অতি ভদ্র ও বিনয়ী। অল্প বয়সী ছেলেরাও কী সুন্দর দলবেঁধে একেবারে চুপ করে বসে দেখছে এই কর্মকাণ্ড। গ্রামের পুরুষ মানুষরা সর্বতোভাবে সাহায্য

পলিমাটির বুকে

সুশীল মণ্ডল

কবিতাকে যখন মন খারাপ ঘিরে ধরে
তখন রামকিঙ্করের মুখটা মনে করার চেষ্টা করি

এখন ভূভারতে কাদম্বিনী দাউ দাউ জ্বলছে
মোহময়ী শ্রাবণের চোখে জল খুঁজে পাই না

হিংস্র আমফান সম্বলমাত্র দস্তার হাঁড়িটা
ওড়াতে ওড়াতে অষ্টমঙ্গলার স্মৃতিটুকু মুছে দিল

প্রশ্ন ঘুরপাক খায় বিদ্যাধরীর ভাঙা বাঁধের সংসারে
চলমান পলিতে পা রেখে আমরা কি বেঁচে আছি?

সিমলিপালের বৃংহণ

সুচরিতা চক্রবর্তী

মাঝরাতে বন বাংলোয় বসে আছি।
গাছপাথর থেকে অন্ধকারের অপরিমেয় ক্ষিদে
কে কাকে খোঁজাখুঁজি করে মাটির গভীরে,
ক্রমশ ঘন হয়ে আসছে শ্বাসবায়ুর লেখচিত্র
পলক টেনে রেখেছে নৈঃশব্দের বিস্ময়
মৃত্যু হাওয়া ছুঁয়ে যাচ্ছে প্রশস্ত বুকের গরাদ
আগোছালো পড়ে আছে আলোয়ান কাঠের
বাংলো ঘরে,
হাত ঘড়ি টিকটিক শব্দে জানায়
আমার সজাগ অনুভবের কাব্য।
শিকার ও শিকারীর লুকোচুরি খেলা খেলে এসেছি
যাপনের বাঘবন্দী ঘরে।

আত্মবিশ্বাস

সোনালী বসু

সকালে যখন হাঁটি ভোর বেলা,
বাতাসে দেখি ঝরা পাতার খেলা।
হিমেল হাওয়ায় শিরশির করে শরীর,
সবুজ ঘাসের বুকে পড়েছে নিশির শিশির।

মনের খেয়ালে ভাবি পৃথিবীতে সবাই একেলা,
আশার নদীতে পাল তুলে তবু বেয়ে যায় ভেলা।
মিছে মায়ায় বন্ধনে বাঁধা ক্ষনিকের জীবন,
কেউ জানেনা সমুখে কখন এসে দাঁড়াবে মরণ।

মনেমনে হয়ে যাই আমি আনমনা,
সোজা পথ ছাড়া কখনও চলবো না।
যদি পারি করবো কারো কারো উপকার,
মানব জীবনের এটাই হবে শ্রেষ্ঠ উপহার।
হিংসা, অহংকার, লোভ রাখি সামলিয়ে,
পরোপকারে এ জীবন দিতে চাই বিলিয়ে।

ক্ষণিকের মোহে ভুল না হয় কোনো,
বিধাতা তুমি আমার এ মিনতি শোনো।
অসীম আকাশের মতো হোক মনটা উদার
সবার উপরে মানুষ সত্য জয় হোক মানবতার।

দেবীপক্ষ

মনিশঙ্কর ব্যানার্জী

আশিনের পেখম মেলা উড়ন্ত সাদা মেঘ,
মিষ্টি বাতাসের ছন্দে নেচে ওঠা
সাদা কাশফুলের তরঙ্গ ঢেউ,
শিহরিত করে রোমাঞ্চিত করে তোলে
প্রকৃতির মোহময় পরিবেশ।

গভীর রাতের জোনাকির ঝিকিমিকি আলো
নিয়ে আসে সাথে করে আনন্দ জোয়ার
বিলীন করে ধরার
অবসাদের মলিন ক্ষণ।

অপেক্ষায় বুক বাঁধা,
ঊষার আলোয় উদ্ভাসিত প্রকৃতি,
হৃদয়ে আশার ডালি,
সবুজ ঘাসের ডগায় শিশির বিন্দুর মুক্তমালা
চেয়ে শুধু অপেক্ষায়
দেবীর আগমনের।

তাইতো হৃদয়
বাঁধভাঙা অধৈর্য্যে প্রহর গোনে শুধু
দেবীপক্ষের সূর্যের রক্তিম কিরণের।

প্রভাতের প্রথম কিরণ ছড়িয়ে দেয়
দিকদিগন্তে,
মায়ের আগমনের
আনন্দের শঙ্খধ্বনি,
জেগে ওঠে ভুবন,
মাতোয়ারা করে তোলে
সমগ্র ত্রিভুবন।

কাঠামো

দিশা চট্টোপাধ্যায়

জানালা দরজার কপাটে
মরচে পড়ে গেছে
আর কতদিন লকডাউনে কাটবে জীবন
এখন আর রোদে ঝলসায় না শরীর
ফুল, ফল ধূপ, ধুনো দিয়ে
পুজোও চড়ায় না কেউ।
ভগবানও কী লকডাউনে?
তখন যদি মানত করি
শুনবেন না কী ঈশ্বর?
মাটির কলসি বেয়ে জল গড়ায়-
দেবীর বোধন শুরু, চারদিন বইতো নয়।
গরুটাও জাবরের আশায়
নির্দ্বিধায় শুকে যায় হাড়িকাঠ
কোথাও কিছু নেই
শুধু কাঠামো ভেসে আছে
যেন অহঙ্কার পড়ে আছে ষোলআনা।

শেফালির আগমনী

ড. অতীন কুমার হাজরা

শরতের শিউলি,
মনেতে ঢেউ তুলি—
সন্ধ্যায় গন্ধে বিভোর,
ভোরে ঘুমে অঘোর।

কুকা বসে চুপিসারে,
মাঝে বাদামী ডানাটারে,
কালোদেহে রঙিন মালায়,
পারিজাত ফুলের ভেলায়।

ডুব দিই নিশ্চুপ—
নিশিপুষ্প ঝরে টুপটুপ,
শরৎ যে এসে গেল
শেফালি ঘরে এল।

একটি দুঃখ যা পৌরাণিক ও আপেক্ষিক

শকুন্তলা সান্যাল

ঐ তো হস্তিনাপুরের মতো কতো দীপ্যমান এপার্টমেন্ট,
গান্ধারীর বিচারতুল্য সুন্দরী উলুপীরা ঘাড় উঁচু করে দেখে।
দেখতে দেখতে তার ইচ্ছেগুলো জখম হয়ে পড়ে।
ওখানে অর্জুনের কোনো স্থান নেই, হয়তোবা ওখানেই আছে সে,
রাজসভার আলো।

যতই ভাবি সুরে সুরে সম্মোহিত হবে সব,
ততই সোনার খাদের মতো ছন্দ গহন আষ্টেপিষ্টে বাঁধে।
কতোবার ভেবেছি আনমনা মানবীর মহামিলন হবে আবার।
নেড়িকুত্তার মতো আমাকেই খেদিয়ে দিয়েছে স্বপ্ন।
পৃষ্ঠপোষন করেছে রমণীয় পদক্ষেপ।

যুদ্ধক্ষেত্রের মতো আপেক্ষিক মঞ্চ,
সেজে থাকা জীবন, যেন নিজেকেই চেনেনা।

মুক্তি

ইতি রায় দেওয়ান

ভালোবাসার মানুষ, যদি তোমাকে ছাড়া ভালো থাকে
দিও ঠিক তেমনি কবে থাকতে তাকে।
তোমার থেকে যদি চায় মুক্তি
সত্যিই যদি তাকে ভালোবাস
দিও তাকে শর্তহীন মুক্তি, নেই তাতে কোন ক্ষতি।
জানি, বুক ভারী হবে, হবে দমবন্ধ।
মনের সাথে লড়াই আসবে নিরন্তর।
উধাও রাতের ঘুম, আছো তুমি, থাকবে
তবুও ক্ষতি নেই তাতে।
জীবন থমকে যায়, হারায় গতি।

ভালোবাসা খরস্রোতা নদী, বইতে থাকে
ভালোবাসার পসরা ছড়াতে ছড়াতে,
কামসিক্ত মানুষ-মানুষীর বুকের দুপারে।

সেই চোখ

আশীষ হাজরা

নারকেল গাছ আমায় সমুদ্রের কথা মনে করায়,
আর সমুদ্র, তোমার অতল চোখের চাহনি...
গভীর, আরো গভীর শরতের পর শরৎ পেরিয়ে
যেখানে আমার অবগাহন।
তারপর আর ফিরতে না পারার এক অঘোষিত আনন্দের ফোয়ারা।
ঐ অতলে বুকের শব শব্দপেয়েছি আমি প্রথম শোনা বৃষ্টি যেন
তোমার চোখের আলো পার করে এক গভীর
নীল পৃথিবীর হাতছানি...
দেখেছি তোমায় যেই, হাওয়ার শব্দে ঢেউগুলো
জানান দিয়েছে আমি কোথায়?
না না তোমার গভীর চোখের অতল পার করে সে এক অন্য দেশ...
অসংখ্য নারকেল গাছ সেখানে
সমুদ্রের সাথে মুখোমুখি,
এক দৃষ্টিহীন সব হারানোর দেশ,
যেখানে তুমিও থাকো...
আমিই শুধু দেখতে পাইনা তোমায়, তোমার এত কাছে থেকে।

বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের উদাত্ত কণ্ঠস্বরে

১ পাতার পর

চলেছে। খুব সম্ভবত মাত্র দুবার এই অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়নি। প্রথমবার নতুনের খোঁজে বাংলার অনেক খ্যাতনামা শিল্পীদের নিয়ে এই একটি অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়েছিল 'দেবী দুর্গতিহারিণী'। এই অনুষ্ঠান উত্তম কুমারের মহালয়া বলে খ্যাত হয়। এর প্রধান উদ্যোক্তা এবং কলাকুশলীদের মধ্যে ছিলেন মহানায়ক উত্তম কুমার, বসন্ত চৌধুরী, লতা মঙ্গেশকর থেকে শুরু করে তাবড় তাবড় তারকা। খুব বড় করে আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। সংবাদপত্রে প্রচুর লেখালেখিও হয়েছিল। মহানায়ক নিজে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের বাড়িতে গিয়ে অনুমতি নিয়ে এসেছিলেন। মহালয়ার দিন সেই অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হওয়ার পর সাধারণ বাঙালি শ্রোতা তা একেবারেই গ্রহণ করতে পারেনি। শুরু হয় প্রবল বিক্ষোভ। সেই বছর ষষ্ঠীর দিন আবার প্রচারিত হয় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে 'মহিষাসুরমর্দিনী'। তখনই বোঝা যায় মানুষের হৃদয়ে এর স্থান কতখানি গভীরে।

দ্বিতীয়বার তাঁর মৃত্যুর পর এক বছর তার কণ্ঠস্বর শোনা যায়নি আকাশবানীতে। কিন্তু এবারও মানুষ অনুভব করল তাঁর প্রয়োজনীয়তা। এইখানেই বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র হয়ে গেলেন কালজয়ী। আজও দেবীপক্ষের সূচনা হয় বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের উদাত্ত কণ্ঠে -

'যা চণ্ডী মধুবৈটভাদিদৈত্যদলনী যা মাহিষোন্মুলিনী / যা ধুম্রেক্ষণচণ্ডমুণ্ডমথনী যা রক্তবীজাশনী। / শক্তিঃ শুম্ভনিশুম্ভদৈত্যদলনী যা সিদ্ধিদাত্রী পরা / সা দেবী নবকোটীমূর্তিসহিতা মাং পাতু বিশ্বেশ্বরী।'

মানবধর্ম

২ পাতার পর

আমরা কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম, আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে কখনোই মন থেকে মেনে নিতে পারি না। আমরা চাই মানুষকে পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গীতাঞ্জলী' কাব্যগ্রন্থে 'ভারততীর্থ' কবিতায় তিনি বলেছিলেন :

'হেথায় দাঁড়ায়ে দুবাহু বাড়ায়ে নমি নর দেবতারে, /উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।'

নরই ছিল তাঁর কাছে নারায়ণ, জীবই শিব, যে মানুষকে তিনি ঈশ্বরের সমান আসন দিতে চেয়েছিলেন সেই মানুষ কোন গোষ্ঠীভুক্ত বা সম্প্রদায়গত বা বিশেষ ধর্মভুক্ত মানুষ নয়। এই মানুষ হচ্ছে 'চিরমানব' 'পরম মানব' বা মহামানব এ মানব ব্রহ্ম।

তাই অবশেষে আমরা বলতে পারি যে, মানব জন্মই শ্রেষ্ঠ জন্ম। মানব জীবনেই সার্থক জীবন।

তাই কবিগুরুর সুরে সুর মিলিয়ে বলব ---

'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে। /সার্থক জন্ম, মাগো, তোমায় ভালোবেসে।'

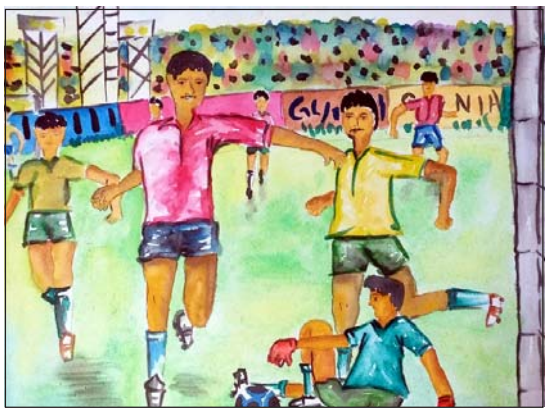

অঙ্কিতা গুপ্ত রায়, রেখা চিত্রম

শ্রবণা সেনগুপ্ত, রেখা চিত্রম

উর্বি সিনহা, রেখা চিত্রম

সোহন দেবনাথ, চিত্রাঙ্গন আর্ট আকাদেমি

বৈভব দে সরকার, অঙ্কনালয় আর্ট সেন্টার

রাজদীপ রায়, আদর্শ চিত্র কলা

সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগর

১ পাতার পর

সংস্কৃত-বাংলা ভাষা শিক্ষা সহজ করার জন্য সমগ্র ব্যাকরণ কৌমুদী, বিধবা বিবাহ প্রচলন হওয়া উচিত কিনা, বাল্য বিবাহ রোধ, যেমন প্রশ্ন তুলেছিলেন তেমনই তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব শিক্ষা সংস্কার, সমাজ সংস্কার।

বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহের মতো সামাজিক অভিশাপ দূরীকরণের যে অক্লান্ত সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল আজকের দুনিয়ায় তা অনুমান করা কঠিন। ১৮৪১ কর্মজীবন শুরু। একুশ বছর বয়সে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলার প্রধান পণ্ডিতের পদ। তারপরের ইতিহাস বিস্তৃত। সংস্কৃত কলেজ, বেথুন সোসাইটি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই কোনো না কোনোভাবে যুক্ত ছিলেন। নিজ উদ্যোগ সংস্কৃত ডিপোজিটারি প্রেস খুলে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে অনেক সাড়া জাগানো পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। সেই প্রেস থেকে প্রকাশিত প্রথম বই বেতাল পঞ্চবিংশতি। আর এই বইতেই প্রথম বিরাম চিহ্নের ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর উদ্যোগে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা। ১৮৫৯ সালের ১ এপ্রিল পাইকপাড়া রাজার সহায়তায় মুর্শিদাবাদের কান্দিতে প্রতিষ্ঠা করেন প্রথম ইংরেজি-বাংলা মাধ্যম স্কুল। ১৮৭৩ সালে কলকাতায় গড়ে ওঠা মেট্রোপলিটান কলেজেই আজকের বিদ্যাসাগর কলেজ। মেদিনীপুরে তাঁর নামেই গড়ে উঠেছে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর নামাঙ্কিত বিদ্যাসাগর সেতু, রাস্তার নামের মধ্য দিয়ে তিনি আজও বাংলা বাঙালির মানসে উজ্জ্বল। ১৮৬৪ সালের ৪ জুলাই ইংল্যান্ডের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি সদস্য করে নেয়, খুব কম ভারতীয়ই এই সম্মানের অধিকারী। জন্ম ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০, প্রয়াণ ২৯ জুলাই ১৮৯১।

জাগো অবিস্মরণীয়

জ্যোতির্ময় গোস্বামী

(প্রখ্যাত লেখক জ্যোতির্ময় গোস্বামীর 'সমাজযোগ' বহুমুখী স্বরোজগার ও সর্বতোমুখী সবুজায়নে সার্বিক সমাজ যোগ। সমবায় সাধনার ধারায় পরিবেশ, স্বরোজগার ও কৃষি সংকটের সমাধানে, ছোট একটি নয়া সংযোজন, সমাজের ত্রিবেণী সাধনা। সমাজযোগ কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলনের সমন্বয়। এই সংকলনের প্রবন্ধগুলি এখন থেকে আনন্দ অঙ্গন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।)

গত সংখ্যার পর

ইংল্যান্ড দেশটাকে, মনে হলো, প্রায় কান ঘেঁষে এড়িয়ে চলে গেলাম। যদি তার ওপর দিয়েও যেতাম, জ্যোতিষ্কলোকের পথে তার রেখামাত্র চিহ্নও দেখা যেত না। এতটাই ওপর দিয়ে চলছিলাম আমরা। এত বড় ক্ষমতাশালী দেশ, আজ তার কী গতি হয়েছে, সেকথা মনে ছিল না। তার আজকের এই দৃশ্যগত অকিঞ্চিৎকরতাই মনকে বড় বিষণ্ণ করে তুললো।

আমার পাশেই বসেছিলেন এক ডাচ দম্পতি। ইংল্যাণ্ডকে দেখতে আমার উৎসাহ দেখে ওরাও দ্বীপটাকে তন্নতন্ন করে খুঁজতে থাকলেন। নিচের 'আকাশে' তাকে কোথাও আবিষ্কার করা গেল না। দক্ষিণ চেপে নিচের দিকে দেখা গেল শুধু নীল আকাশেরই ব্যাপ্তি।

যখন কিছুই দেখা যায় না, মন তখন অকূল পাথারে অত্যন্ত তেজ নিয়ে সাঁতার দিতে থাকে। বিশ্ব ধর্মমহাসভায় কথা চেপে বসল মনের ওপর। কী জন্যে যাচ্ছি এই মহাসভায়? আমি কী দিতে পারি তাকে আর পেতেই পারি বা কী, মন অলসভাবে বিচরণ করতে লাগল সেই সব চিন্তারই আনাচে কানাচে। দেশের লোক আমার কথা বোঝে না বলে মনে যখন নেশাগ্রস্তের মতো একটা দুঃখের নেশার মধ্যে ডুবে যেতে চাইছে, মনীষী অম্লান দত্তের কথা মনে পড়লো। খুব জোর পেলাম মনে। তারপর পশ্চিমবঙ্গের দু-দুটো সরকারের অনুমোদনের কথা এবং অসংখ্য গ্রামীণ মানুষের কথা, যাঁরা গত প্রায় কুড়ি বছর ধরে উচ্চকিত হয়েছে আমাদের কাজের প্রয়োগের সুফল দেখবার জন্যে।

পাশের ডাচ ছেলেটিও তার স্ত্রী ব্যবসাজীবী। কিন্তু ধর্মসভা সম্পর্কেও যথেষ্ট আগ্রহী। ধর্মের অবাঙমনসগোচর কোনো ব্যাপার-স্যাপারে আমার অধিকার আছে ভেবেই বোধহয় খুব সমীহ করতে লাগল। আমার জায়গা হয়েছে জানালার ধারেই। আসন ছেড়ে যাবার দরকার হলে দুজনেই সসম্ভ্রমে তটস্থভাবে দূরে উঠে গিয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে রাস্তা করে দিচ্ছিল। একবার দুবার নয়। তিনতিন বার। একইরকম যত্নে সঙ্গে। বুঝতে পারা যায়, ধর্ম সম্পর্কে পশ্চিমের সাধারণ মানুষের মধ্যেও বেশ একটা সমীহ ভাব রয়ে গেছে মনে হয়।

গ্রীনল্যান্ডের প্রায় চরণ ছুঁয়ে বিমান যখন কানাডার আকাশে প্রবেশ করল, তখন সেখানকার ঘড়িতে সময় সকাল এগারোটা। টরেন্টোয় ঢোকার আগে প্রায় ঘণ্টা খানেক বিমানপথ জুড়ে এক আশ্চর্যরকমের পাহাড় দেখা গেল। মালভূমির মতো।

এরপর আগামী সংখ্যায়

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ

ঘোলা (সি ব্লক), প্লট নং- ৭২১, সোদপুর, কলকাতা-৭০০ ১১০
যোগাযোগ ঃ 8617847889/9382831611/ 9874566708/8910739009
Email : shilpakalaparishad@gmail.com
Whatsapp: 8617847889/9874566708

ব্রাঞ্চ অফিস ঃ এন. পি. এ-৩৫৫, নজরুল পল্লী, ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-১০২, যোগাযোগ ঃ ৯৮৭৪৫৬৬৭০৮
Facebook : sarbabharatiya shilpakala parishad

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ

বর্তমানে সারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় থাকা চিত্রশিল্পী, অঙ্কন শিক্ষক, শিক্ষিকার দ্বারা প্রশংসিত। এই প্রতিষ্ঠান শিল্পীর শৈল্পিক স্বপ্নকে জাগিয়ে তুলবে সৃষ্টির প্রেরণার মাধ্যমে।

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের শিল্প সমৃদ্ধ পাঠাগার, শিল্পকলা ও অঙ্কন শিল্পীদের অধ্যয়ন এবং গবেষণা ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার কর্তৃক এন. পি. এ-৩৫৫, নজরুল পল্লী, ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-১০২ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত।
যোগাযোগ ঃ ৯৮৭৪৫৬৬৭০৮ (মোঃ ও হোয়াটস্অ্যাপ)। সম্পাদক ঃ কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার। E-mail : k.sarkar151071@gmail.com